দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 05 APR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলা ৩ ...

034

আদিগন্ত

রাহাগীর

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। তবে, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মান, জাতীয় জীবনে শিক্ষার বাস্তব ফলাফল নিয়ে কেউ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন— এ রকম কথা কিন্তু শোনা যায়নি। বরং, একথাটি বহুবার বহুভাবে বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে যে, একটি স্বাধীন এবং উন্নয়নগামী জাতির জন্য পরিপূর্ণভাবে অনুকূল একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। জাতি হিসেবে আমাদের এ ব্যর্থতার কথা এক লাইনে বলে শেষ করে দেয়া গেলে বিষয়টি তেমন অসুখকর কিছু হতো না। তবে, তা করা যায় না এবং যাচ্ছে না। কারণ, শিক্ষা একটি জাতির জন্য এমন একটি বিষয় যা সরাসরি জাতির প্রাণ সম্পদের উৎসভূমি হিসেবে গণ্য হয়। যে কোনো বস্তু সম্পদ— সে যত ক্ষুদ্রই হোক— প্রাণ সম্পদের যোগান না থাকলে তার উৎপাদন বা উৎপত্তি সম্ভব নয়। মানব জাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোনো জাতি যখনই প্রাণ সম্পদে দুর্বল হয়ে পড়েছে, হীনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তখনই তার বস্তু সম্পদের পতন শুরু হয়েছে। আর এ পতনের পথ ধরেই স জাতি একদিন অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

কাজেই, শিক্ষা এমন একটি বিষয়— যার প্রতিটি স্তর বা পর্যায় এবং প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনার দাবীদার। এ বিবেচনা না থাকলে অর্থাৎ কোনো জাতি যদি এ বিবেচনায় না নামে তাহলে, সে জাতির জীবনে শিক্ষা সুফলের পরিবর্তে কুফল ডেকে আনে। জাতির প্রাণ সম্পদের উদ্বোধন, বিকাশ এবং প্রাণ সম্পদের ভিত্তি-ভূমির উপর জাতির বাস্তব ব্যবহারযোগ্য বস্তু সভ্যতার মজবুত ও বহুমুখী অবকাঠামো গড়ে না উঠাটাই একটি জাতির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি।

আজ আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে বিশৃংখলা, অনিয়ম, দুর্নীতি, জটিলতা, স্থবিরতার মোকাবিলা করছি— তার মূল খুঁজতে গেলে আমাদের গিয়ে পৌঁছতে হবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই। কারণ, শিক্ষাই নাগরিকদের মন-মানসিকতার বিকাশ ঘটায়, প্রাণ সম্পদে ভরপুর করে তোলে। আর এ মন-মানসিকতা তথা প্রাণ সম্পদই জাতির চলার পথের পাথেয়। এ পাথেয় যদি দূষিত হয়ে পড়ে বা ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে, জাতির জীবনে বিশৃংখলা, অনিয়ম, দুর্নীতি, জটিলতা, স্থবিরতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিশদ ব্যাখ্যা না করেও বলা যায়, আমরা আজ জাতি হিসেবে এ অনিবার্যতারই শিকারে পরিণত হয়েছি।

জাতীয় উন্নয়নের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমরা অনেক সময়ই এমন দুয়েকটি নজির উল্লেখ করি— যার বা যাদের শুরুটা আমাদের শুরুর চেয়ে অনেক অনেক বেশী বিপর্যস্ত ছিলো। এক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই যে নামটি উচ্চারণ করি সেটি হলো পশ্চিম জার্মানী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে হিটলারের এ দেশটি কি পরিমাণ বিপর্যস্ত হয়েছিলো এবং কি রকম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো তা আমরা জানি। এবং যুদ্ধ শেষে কিভাবে বিভক্ত করে দেশটির সোজা হয়ে দাঁড়াবার শেষ সুযোগটুকুও কেড়ে নেয়া হয়েছিল— তাও আমরা জানি।

কিন্তু, তারপর আমরা কি দেখলাম? মাত্র এক-দেড় দশকের মধ্যেই দেশটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। শুধু তাই নয় আরো এক দশকের মাথায় এসে পশ্চিম জার্মানী অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অগ্রযাত্রার মিছিলে জোর কদমে সামনের দিকে এগুতে লাগলো। এবং চার দশক পার হবার আগেই শিল্প-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম সারির দেশ কয়টির মধ্যে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করে ফেললো।

অন্যান্য দেশ বা জাতির অগ্রগতির ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে পশ্চিম জার্মানীর এ অগ্রগতি বিস্ময়কর বলেই ঠেকে। বিশেষ করে, আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই তাহলেও এ একই কথা বলতে হয়।

পশ্চিম জার্মান জাতির হাতে তো আর আলাদীনের চেরাগ ছিলো না যে, তারা 'হও' বলেছে আর একে একে সব শিল্প-কারখানা হয়ে উঠেছে। কিন্তু, তাদের হাত ছিল আর সে হাতকে দ্রুত দক্ষতার সাথে সৃষ্টিশীল কর্মে ব্যবহার করার মতো প্রাণ সম্পদ ছিল, ছিল মানসিক শক্তি। এটি তারা পেয়েছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে। আর এ জাতীয়তাবাদী চেতনা তারা প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে শক্ত ভিত্তিতে উপ্ত করতে পেরেছে সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা।

পশ্চিম জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থা যে নীতিমালার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে তার লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে, জাতির বাস্তব প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য করে। তাদের শিক্ষানীতির প্রথম লক্ষ্য তরুণ সমাজকে এমন দক্ষতার দ্বারা সজ্জিত করা— যা তাদের কর্ম-জীবনের সহায়ক হয় এবং তাদের মধ্যে সুপ্ত সৃজনশীল তৎপরতা জাগিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম ও ইচ্ছুক নাগরিকের প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য রেখে তারা এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে যা তরুণ সমাজে স্বাধীনতা ও সংহতি চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে সামাজিক দায়িত্ববোধের জন্ম, দেয়।

কর্মজীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের চেতনা ছাড়াও পশ্চিম জার্মানীর শিক্ষানীতির আরো কতিপয় লক্ষ্য রয়েছে। তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা করছি না। আমরা শুধু বলতে চাই, এ দু'টি বিষয়ের কথা আমাদের এদেশেও বহুবার বহুভাবে উচ্চারিত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার তাগিদও দেয়া হয়েছে। কিন্তু, তারপরও এই ঢেলে সাজাবার কাজটি হয়নি। অথচ, এ কাজটি স্বাধীনতার পর পরই করা ছিল অপরিহার্য। কিন্তু পশ্চিম জার্মান জাতি তাদের ক্ষেত্রে যা সহজেই পেরেছিলো, আমরা তা পারিনি।

আমরা যদি আমাদের ছাত্র সমাজকে ভবিষ্যতের কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারতাম এবং তাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সংহতির চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে সামাজিক দায়িত্ববোধের জন্ম দিতে পারতাম তাহলে, আজ বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের যে বিশৃংখলা ও জড়তার মোকাবিলা করতে হচ্ছে তা করতে হতো না। কারণ, আজ যাদের দক্ষতাহীনতার দরুণ এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা ও দায়িত্বহীনতাহেতু দুর্নীতি, অনিয়ম, বিশৃংখলা ও জড়তা জাতীয় জীবনকে প্রতি মুহূর্তে পিষ্ট করছে, থেতলে দিচ্ছে— শিক্ষা জীবনে তাদের আমরা উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারিনি।

একথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না, একজন ব্যক্তিকে তার শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায়; তাহলে কর্মজীবনে সে জাতিকে তার মেধা ও শ্রমের পরিপূর্ণ ফসল দিতে সক্ষম হবে। আজ প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিচ্যুতির যে মহামারী আমরা দেখছি এবং জাতি আজ যে জন্য দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে— তার প্রথম ও প্রধান কারণ জাতির প্রতি দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার অভাব এবং অদক্ষতা ও অযোগ্যতা। অর্থাৎ, আমরা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারছি না, জাতির প্রতি, দেশের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তুলতে পারছি না।

আর এসব না পারার মূল কারণ আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমাদের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে— জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে নতুন করে ঢেলে সাজাতে পারছি না। আসলে, এ পারছি না কথাটিই দুঃখজনক। একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতির জীবনে এ ধরনের পারছি না— এর অস্তিত্ব সত্যিই দুঃখজনক। একথাটি আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি ততই মঙ্গল।